দুর্গা বাঁড়ুয্যে ও দীনু ভট্‌চায ঃ

'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে গঙ্গাচরণ ব্যতীত দুটি হত-দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরিত্র আছে—দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং দীনু ভট্‌চায। দুর্গা বাঁড়ুয্যের পদবী নিয়ে বিভূতিভূষণ একটু গোলমাল সৃষ্টি করেছেন। দুর্গা বাঁড়ুয্যের সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হচ্ছে তখন লেখকের কথায়—'গঙ্গাচরণ বললে—মহাশয়ের নাম? —আজ্ঞে দুর্গা বাঁড়ুয্যে।'

আবার উপন্যাসের শেষে দেখি, 'দুর্গা ভট্‌চায বললে—চলো ভায়া, আমরা দুজনে যা হোক করে ওটির ব্যবস্থা করে আসি। এখানে 'বাঁড়ুয্যে' আর 'ভট্‌চায' দুজনে মিলে গোলমাল পাকিয়েছে। তবে গল্প পাঠে বিশেষ কোন বিপত্তি হয়নি। বিভূতিভূষণ অবশ্য দুর্গা বাঁড়ুয্যেকে মাঝে মাঝে দুর্গা পণ্ডিতও বলেছেন। আলোচনার সুবিধের জন্য দুর্গাকে আমরা দুর্গা বাঁড়ুয্যেই বলবো। কারণ আর একজন ভট্টাচার্যবংশীয় দীনু ভট্‌চায যখন গল্পের মধ্যে আছে। দু'ব্যক্তির দুটি ভিন্ন পদবী থাকাই ভাল। এছাড়া দুই ব্রাহ্মণের পোষ্য সংখ্যা নিয়েও কিছুটা অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়। দুর্গা বাঁড়ুয্যে তার পরিবারের আয়তন বোঝাতে গিয়ে প্রথম দিনে গঙ্গাচরণকে বলেছে, একটি মাত্র মেয়ে, তার পরিবার

অর্থাৎ স্ত্রী, তার বিধবা ভগ্নী—মানে তাকে সুদ্ধ নিয়ে মোট চার জন। আর দীনু ভট্চায বলেছে—'চালের দাম হু হু করে বাড়চে। ছিল সাড়ে চার, হল ছ' টাকা। পাঁচ-ছটি পুষ্যি নিয়ে এখন চালাই কি করে বলুন?' আবার উপন্যাসের শেষের দিকে দুর্গা বাঁড়ুয্যের পরিবার যখন দেশত্যাগ করে চলে আসছে, তখন গঙ্গাচরণকে সে বলছে—'বাড়ির সবাই আসচে কিনা। আমার স্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে।' উপন্যাসের ঘটনাকাল হিসেব করলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক দেড় বৎসরের ব্যবধান। তার মধ্যে দুর্গা বাঁড়ুয্যের বিধবা ভগ্নী মারা যেতে পারে, কিন্তু দুটি ছেলের আগমন অসম্ভব মনে হয়। তবে যমজ সন্তান জন্মানো অসম্ভব কিছু না। যাইহোক, এ সবই আলোচনার জন্য আলোচনা। উপন্যাসের আসল বক্তব্য এতে ব্যাহত হয়নি।

বিভূতিভূষণ প্রধানত দেখাতে চেয়েছেন গ্রামের জোতজমাহীন পুরোহিত বা শিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ ছিল, তার উপর মন্বন্তরে তারা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দীনু ভট্চাযের কথাই প্রথমে ধরা যাক। কামদেবপুরে গাঁ-বন্ধ করে গঙ্গাচরণ গরুর গাড়ি করে যেদিন ফিরছিল, পুরোহিত দীনু ভট্চাযের সঙ্গে সেদিনই প্রথম দেখা। সে পথের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। খুব কাতর মিনতি করে সে গঙ্গাচরণকে গাড়ি থেকে নেমে তার কথা শোনবার জন্য অনুরোধ জানাল। বললে—'আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন।' সে আরও জানাল বুড়ো বয়সে সে ছাড়া তার রোজগার আর করার কেউ নেই। পাঁচ-ছটি পোষ্য নিয়ে সে খুব বিপদে পড়েছে। তার উপর চালের দাম হু হু করে বাড়ছে। গঙ্গাচরণ এর আগেই একজনের কাছে চালের এই দাম বৃদ্ধির কথা শুনেছিল। কিন্তু তখন তেমন বিশ্বাস হয়নি। এখন দীনু ভট্চাযের মুখেও সেই কথা শুনে গঙ্গাচরণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। দীনু ভট্চায আরও জানাল, যুদ্ধের জন্যই নাকি এইসব হচ্ছে। গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে, ওসব চর্চা করার সময় পায় না; তাছাড়া এ গ্রামে খবরের কাগজও আসে না। দীনু ভট্চায অর্থ উপার্জন করতে পারে না, কিন্তু খবর সংগ্রহ করে।

যাইহোক, গাঁ-বন্ধ করে গঙ্গাচরণের প্রাপ্তি ভালই হয়েছিল। সে নিজের পাওনা থেকে কিছু চাল ডাল দীনু ভট্চাযকে দিল। কিন্তু গাওয়া ঘি দিতে চাইলে দীনু ভট্চায নিল না। সে বললে—'বলে ভাত জোটে না, গাওয়া ঘি!' সে দরিদ্র কিন্তু অধিক লোভ তার নেই। সে ভগবানের কাছে গঙ্গাচরণের মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিল।

যুবাবয়সী গঙ্গাচরণের তুলনায় দীনু ভট্চায সত্যিই খুব অক্ষম, অসহায়। সে বৃদ্ধ হওয়ায় যজমানের কাছে পুরোহিত হিসেবে তেমন আদর আর পায় না। তাছাড়া গঙ্গাচরণের মত ভড়ং দেখিয়ে সুযোগমত নিজের আখেরও সে গুছিয়ে নিতে পারে না। তাই গঙ্গাচরণের প্রশংসা করে লোকে বলে—'একি তুই যা তা পেলি রে? ওঁর পেটে এলেম কত? যাকে বলে পণ্ডিত। একি তুই বাগান-গাঁর দীনু ভট্চায পেয়েছিস?'

কিন্তু বিভূতিভূষণ দীনু ভট্চাযকে অবহেলা করেন নি। অনঙ্গ-বৌয়ের মত মাতৃমমতা দিয়ে দীনু ভট্চাযের মত দীনহীন মানুষদের জীবনের দুঃখ-গ্লানিকে তিনি মুছিয়ে দিতে চেয়েছেন। গঙ্গাচরণের অনুপস্থিতির সময় তার বাড়িতে এলে অনঙ্গ ক্ষুধার্ত দীনু ভট্চাযকে অত্যন্ত যত্নসহকারে ভোজন করিয়েছে। মোটা আউশ চালের রাঙা ভাত, ঢেঁড়শ ভাজা, বেগুন ও শাকের ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে দীনুর অপরিমেয় তৃপ্তি। সে বলে, 'মা-লক্ষ্মীর রান্না

যেন অমর্তো।' খাওয়ার পর অনঙ্গ তাকে তামাক সেজে দিয়েছে। কিন্তু অনঙ্গ তার নাতনীর বয়সী হলেও বাড়ির বধূ হয়ে বাইরের কোন অতিথিকে তামাক সেজে দেওয়ায় দীনু ভট্চায কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। এতে নারীর প্রতি তার সম্ভ্রমবোধ লক্ষণীয়।

গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরলে দীনু ভট্চায তাকে চালের দুর্মূল্যের কথা বলেছে। এবং বলেছে কিভাবে একমুঠো চাল জোগাড় করা যায় সেই পরামর্শ করতেই তার আসা। গঙ্গাচরণ বলেছে তার কিছু করার নেই। তবে গ্রামের বিশ্বাসমশাইয়ের কাছে একবার গিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু দীনু ভট্চায কপর্দকহীন; সে চাল কিনবে কী দিয়ে? শেষ পর্যন্ত অনঙ্গ তার হাতের পেটি বন্ধক দিয়ে গঙ্গাচরণকে বলেছে দীনু ভট্চাযের জন্য চালের ব্যবস্থা করে দিতে। নাহলে সে মাথা খুঁড়ে মরার ভয় দেখিয়েছে। গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথা রেখেছে।

পিতার বয়সী বৃদ্ধ দীনু ভট্চার্যের প্রতি অনঙ্গ-র স্নেহমমতার যেন শেষ নেই। ভাত খাওয়ানোর পর সে দীনু ভট্চাযকে খেজুর গুড় দিয়ে পাকা কাঁকুড় খেতে দিল, অপরের বাড়ি থেকে চা এনে চা খাওয়ালো। আর দীনু ভট্চাযকে অনঙ্গ যা খেতে দেয় তাই তার কাছে, 'চমৎকার'! 'অমর্তো'! আসলে এইসব গরিব দুঃখী মানুষ যারা জীবনে ভালো জিনিস অনেক দিন খেতে পায় না, তারা একদিন খাবার পেলে যে কী গোগ্রাসে গেলে, কী আনন্দ করে খায় তা বিভূতিভূষণ এদের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। এইসব মানুষগুলির জন্য বিভূতিভূষণের এক ধরনের সহৃদয় অনুকম্পা ছিল। দীনু ভট্চাযের কথাগুলো অত্যন্ত করুণ হয়ে আমাদের কানে বারবার বাজে—'বুড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহ্যি করতে পারিনে আর। ...বুড়ো বয়সে এবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখচি।' মন্বন্তরে সমস্ত অন্নহীন মানুষের কান্না বিভূতিভূষণ যেন এর মধ্যে দিয়েই শুনিয়েছেন।

কুমুরে নাগরখালির দুর্গা বাঁড়ুয্যেকেও আমরা প্রথম থেকে এই অন্নচিন্তাতেই ক্লিষ্ট হতে দেখি। সে অম্বিকাপুরের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের 'সেকেন' পণ্ডিত। কিন্তু স্কুলের মাইনে, গভর্নমেন্টের এড্ ইউনিয়ন বোর্ডের এড্—সব মিলিয়ে যে পৌনে সাত টাকা পায়, তাতে চারজনের সংসার তার ভাল চলে না। চলে না, কারণ গঙ্গাচরণের মত বাস্তববুদ্ধি তার নেই। মাস্টারি করার সঙ্গে লক্ষ্মীপুজো, যষ্ঠীপুজো প্রভৃতি পাঁচটা পাঁচ রকম করে উপরি আয়ের ধান্দা সে করতে পারে না। অথচ 'একটু ধম্মকথা একটু সৎ আলোচনা বড্ড পছন্দ' তার। তবে সমব্যবসায়ী বলে নিজের দুঃখের কথাটা সে গঙ্গাচরণকে খুলে বলে গেল।

দুর্গা পণ্ডিতের সঙ্গে গঙ্গাচরণের দ্বিতীয়বার দেখা হল পাঠশালা থেকে ফেরার পথে। দেখা হতেই সেই এক কথা—পৌনে সাত টাকা মাইনেতে সংসার একেবারে অচল। চালের দাম চার থেকে হল ছ' টাকা, এখন দশ টাকা। গঙ্গাচরণের বুক ধক্ করে উঠলো। বললে—কোথায় শুনলেন? দুর্গা পণ্ডিত বললে, রাধিকাপুরের বাজারে গেলেই জানা যাবে। আসলে অভাবে পড়ে দুর্গা বাঁড়ুয্যেকে অনেক খোঁজই রাখতে হয়েছে—কেরোসিন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, দেশলাইও নেই।

এদিকে গঙ্গাচরণের বাড়ি এসে দুর্গা বাঁড়ুয্যে কেবল গল্পই করছে, উঠতে চাইছে না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাচরণের সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সে বলেই ফেলল, এবেলা এখানেই সে দুটি খাবে। দীনু ভট্চাযের মত দুর্গা বাঁড়ুয্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা, বড়াভাজা দিয়ে দুর্গা

বাঁড়ুয্যে দারুণ খেল। তাতেও হল না। সে চাইল তেঁতুল, গুড় আর কাঁচা লঙ্কা। গঙ্গাচরণ ভাবলো, তার দু'বেলার আহার দুর্গা পণ্ডিত একাই খেল। আর অনঙ্গ তার কাকার বয়সী এই অতিথির পাতে নিজের জন্য রাখা বড়াভাজাগুলো সব এনে ঢেলে দিল। কারণ যে খেতে পারে তাকে খাইয়ে আনন্দ আছে। তবে শুধুমাত্র খাদ্যরসই দুর্গা বাঁড়ুয্যেকে তৃপ্তি দেয়নি; তৃপ্তির মূলে ছিল পরিবেশনকারিণীর পরিবেশন-নৈপুণ্য, তার হৃদয়ের স্নেহরস ঃ অনঙ্গ-বৌ লজ্জা-কুণ্ঠাজড়িত সুঠাম সুগৌর কাঁচের চুড়ি পরা হাতে গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা এনে দুর্গা পণ্ডিতের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পণ্ডিত ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে— 'মা যে আমার লক্ষ্মী পিরতিমে।' এই মাতৃরূপ যুগে যুগে ক্ষুধার্ত পুরুষ-চিত্তকে মুগ্ধ করেছে, পরিতৃপ্ত করেছে। ইছামতীর রূপচাঁদ মুখুজ্যে নালুপালের দেওয়া ব্রাহ্মণভোজনে বসে তিলুর মধ্যে এই রূপকেই দেখেছিলেন। বিভূতিভূষণও প্রেয়সীর মধ্যে এই শ্রেয়সী জননীকেই দেখতে চেয়েছেন বারবার।

দুর্গা পণ্ডিত সেবার যাবার সময়ে অনঙ্গর উদ্দেশে বলে গেল—'যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁই দিও অন্নপূর্ণা। বড্ড গরিব আমি।'

অনঙ্গ ছলছল নেত্রে চেয়ে রইল দুর্গা বাঁড়ুয্যের গমনপথের দিকে। ....

কয়েকদিন পরে দুর্গা বাঁড়ুয্যে আবার এল তার ত্রাণকর্ত্রী মায়ের কাছে। এবার তিন দিনের উপবাসী। শুধু সে একা নয়, উপবাস করেছে বাড়ি সুদ্ধ সকলেই। চিনি নেই, কত দিনের পুরোনো চা নুন দিয়ে খেয়ে তার উপবাস ভঙ্গ হল। থেকে গেল সে তিন দিন। বসে না থেকে সে বেড়া বাঁধতে লাগল। বোধহয় বিনা পরিশ্রমে বসে খেতে তার লজ্জা কিংবা কাজ করে নিজের আশ্রয়ের ভিতটা সে পাকা করে নিতে চায়।

অবশ্য পাকাপাকি আশ্রয়ের জন্য দুর্গা পণ্ডিত আরও কয়েকদিন পরে এল। সঙ্গে স্ত্রী, দুটি পুত্র এবং বোড়শী কন্যা ময়না। কিন্তু যাদের নিজের খাবার সংস্থান নেই, তারা আশ্রিতদের কী খাওয়াবে? তার উপর সদ্যপ্রসূতি অনঙ্গ এখন রুগ্‌ণ, খুবই দুর্বল। অনন্যোপায় হয়ে দুর্গা বাঁড়ুয্যে ভিক্ষে করতে শুরু করল। এতে তার লজ্জা নেই। কারণ ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হল ভিক্ষা। এর সঙ্গে সে গঙ্গাচরণকে প্রস্তাব দিল চাষাদের গ্রামে গিয়ে জ্যোতিষচর্চা করতে। কারণ ওদের হাতে পয়সা আছে। কিন্তু গঙ্গাচরণ জানে, ধান চাল না থাকলে টাকা-পয়সায় কিছু হবে না। তাই সে জমি জোগাড় করে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করার উপদেশ দিল। পরান্নভোজী ভিক্ষাজীবী হওয়ার থেকে কৃষিজীবী হওয়া ঢের সম্মানের। চাকুরিহীন জোতজমিহীন তথাকথিত ভদ্রলোকদের এবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। কৃষি- বিমুখ মানুষরাই এই মন্বন্তরে মার খাচ্ছে বেশি করে। দুর্গা বাঁড়ুয্যে কী ভাবল বোঝা গেল না।

কিন্তু দুর্গা বাঁড়ুয্যের ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল মতি-মুচিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে। অচ্ছ্যুত বলে মতির শব কেউ স্পর্শ করতে চাইল না। গঙ্গাচরণ দুর্গা পণ্ডিত প্রভৃতি উচ্চ জাতের মানুষেরা বিমুখ হয়ে রইল। কিন্তু অনঙ্গ কাপালী-বৌ নারী হয়েও যখন এই সমাজবিরোধী কাজে এগিয়ে গেল, তখন দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং গঙ্গাচরণের শ্রেণী-চেতনার খোলসটা হঠাৎ খুলে গেল। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আসল মানুষটা। মানুষের পরিচয় তার জাত দিয়ে নয়, হৃদয়ধর্ম দিয়ে। সেই নবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্গা বাঁড়ুয্যে গঙ্গাচরণের আগে এগিয়ে গেল। এই বিবর্তন-ধারাতেই দুর্গা বাঁড়ুয্যে এ উপন্যাসে একটি জীবন্ত ও সার্থক চরিত্র। দীনু ভট্‌চাযের চেয়ে সে উপন্যাসে বড় কর্তব্য করেছে।